International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/2
VOLUME-1, ISSUE-2-3, ibjcal2019SD08, pp. 120-127

IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

বাঙালি হিন্দু বিবাহ সংস্কৃতির লৌকিক জীবন ভাবনার নগরায়ন

অমিত কুমার নন্দী
পি.এইচ.ডি গবেষক; তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
চলভাষ: +৯১-৯৪৩২৪৫৩০৫০; বৈদ্যুতিন যোগাযোগ: amitnandiju@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Received (revised form) NA
Accepted
Paper_Id: **ibjcal2019SD08**

Keywords:
বাঙালি
হিন্দু বিবাহ
বিবাহের লোকাচার
নগর
বিশ্বায়ন

ABSTRACT

বিবাহপ্রথা একটি প্রবহমান সংস্কৃতি যেটি আদিমকাল থেকেই মানবসভ্যতার বংশগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহপ্রথাতেও এই বদল ব্যতিক্রমী নয়। বাঙালি হিন্দু বিবাহের লোকাচারগুলিকে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বিবাহের লোকাচারগুলিকে লালন ও বহন করে নিয়ে চলেছে বাংলার গ্রামসমাজ। বিশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এই লৌকিক আচারগুলি অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। এই গবেষণা প্রবন্ধে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে বিবাহের প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান লৌকিক জীবনভাবনা ও আচারগুলি কিভাবে সমাজ-সময়-পরিস্থিতির যূপকাষ্ঠে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

মূলপ্রবন্ধ

বাংলা, বাঙালি, বাঙালিত্ব শব্দগুলি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি শব্দই একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষা-জাতি-সংস্কৃতিকে সূচিত করে। বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির অন্তর্গত কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা খ্রিস্টান, বা বৌদ্ধ, বা জৈন। বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির রূপ সমগ্র বঙ্গদেশে এক মাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। তা সত্ত্বেও এই বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও কোথাও যেমন সাযুজ্য আছে, তেমনি আছে বৈচিত্র্য। বিশেষ করে এই বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতির উৎপত্তি প্রাচীন আর্য সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠেনি। এই "বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির মননে এবং অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে এবং জাদুতে তার আস্থাও অবচেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ, দেবতা, নারী দেবতা, পশু-পাখি দেবতা, দেহচর্যা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তুক-তাক-দারু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচাটন, কবচ-মাদুলি এবং বশীকরণে আস্থা তাদের আজো অবিচল। সভ্য বাঙালির অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় জ্ঞাতি পার্বত্য আরণ্য কৌম-কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, হাজঙ, খাসিয়া, মনিপুরী, লওসাই, নাগা, মিজো, খুমি, তিপরা, মুরং, কুকী, কোচ প্রভৃতির মধ্যে যেসব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তাদের অনেকগুলোই ভিন্নাকারে বা সামান্য রূপান্তরে সভ্য বাঙালির প্রথাসিদ্ধ আচারে রয়ে গেছে। আমাদের ঘরোয়া অনেক আচার-অনুষ্ঠানে, প্রথায়-পার্বণে, মৃতের সৎকারে, শ্রাদ্ধে, বিশ্বাসে-সংস্কারে

আদিম রীতি-নীতির ছিটেফোঁটা এখনো মেলে।" (আহমেদ শরীফ, পৃ. ৩৮-৩৯) ফলে বল্লালসেন পরবর্তী সময়ে আর্য কৌলীন্য প্রথা এবং শাস্ত্রাচার বাঙালি সমাজে চাপিয়ে দিয়ে নব্যব্রাহ্মণ সমাজে কৃত্রিম বর্ণবিন্যাস স্থাপন করলেও বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কৌম সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ভাবে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত এই বাঙালি হিন্দুর ইতিহাস ও জীবনচর্যা নিহিত আছে এই জাতি-সংস্কৃতির লোকধর্ম, লোকশ্রুতি, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকবিশ্বাস-সংস্কার ও সর্বোপরি লৌকিক জীবনসংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে। এই বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতির স্বরূপও যেমন এক নিগড়ে বাঁধা নয় তেমনি তা স্থিরীকৃতও নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তনও ঘটেছে অল্প-বিস্তর। এই বাঙালি হিন্দু ধর্মের পালনীয় দশ সংস্কারের মধ্যে একটি সংস্কার হল বিবাহ। বিবাহ নামক সংস্কারটির দুটি দিক লক্ষ্যণীয়। একটি শাস্ত্রাচারের দিক ও অপরটি লোকাচারের দিক। বাঙালি হিন্দু, বিবাহের শাস্ত্রাচারের ক্ষেত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রের নিয়মনীতি অনেকক্ষেত্রে মেনে চললেও লোকাচারের ক্ষেত্রে স্থানিক ও লৌকিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে চিরকাল। এক্ষেত্রে এই গবেষণা নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় বাঙালি হিন্দু বিবাহের লোকাচার।

সময়ের ধারাপাতে বিবাহ প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপ পেলেও এই বাঙালি হিন্দুর বৈবাহিক সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক রূপ এবং একটি একটি স্থানিক রূপ ও ঐতিহ্যও আছে। অর্থাৎ বর্ধমান বা বীরভূমের বাঙালি হিন্দু আর বরিশালের বাঙালি হিন্দু, বা একদিকে মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুরের বাঙালি হিন্দু ও অপরদিকে মৈমনসিংহ, বা একদিকে নোয়াখালি ও অন্যদিকে নদীয়া প্রভৃতি স্থানের সব ক্ষেত্রেই বাঙালি হিন্দু, বিবাহ-সংস্কৃতির শাস্ত্রাচারের ক্ষেত্রে সচরাচর কতকগুলি সাধারণ কৃত্যানুষ্ঠানকে এবং লোকাচারের ক্ষেত্রে স্থানিক রীতি-নীতি সম্বলিত লৌকিকতাকেই প্রাধান্য দেয়।

কিন্তু বর্তমানে মনুষ্যসমাজে ব্যবহৃত ও পালিত লোকাচারগুলি ঠিক কোন্ সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও মনে করা হয় মানবসভ্যতার আদিলগ্নের সময় থেকেই এই বহু-বিচিত্র ধরনের বিভিন্ন আচার-সংস্কার সর্বস্ব অনুষ্ঠানগুলির উদ্ভব ঘটে। মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবহারিক প্রয়োজনেই আদিম কাল থেকে এই আচারাদির সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। এই মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের স্তর বা ধারাটিকে হেনরি লুইস মর্গ্যান তাঁর 'এন্‌সিয়েন্ট স্যোসাইটি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, বন্য অবস্থা থেকে মানুষ যখন বর্বর অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে তখন থেকেই মানুষের আচার-সংস্কারগুলি তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ, মানবসভ্যতার সৃষ্টির আদি লগ্নে অর্থাৎ মানুষের বন্য অবস্থার নিম্নতম অবস্থা বা পর্যায় থেকে সভ্য অবস্থায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে প্রয়োজনের নিরিখে। সেজন্য প্রথমদিকে মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে তার প্রয়োজন বাড়তে থাকে। বন্য অবস্থা থেকে মানুষ যত সভ্য হবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তত তার জীবনধারণের উপকরণ ও উপাদানগুলির চাহিদা বাড়তে থাকে। এর ফলেই আস্তে আস্তে মানুষ সভ্য হবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মর্গ্যান মানুষের এই বিবর্তনের ও সভ্যতার উন্নতির স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত স্তরভেদের বিকাশকে ক্রমানুসারে সাতটি সম্বন্ধের দ্বারা জুড়তে চেয়েছেন। এই মানবসভ্যতার বিকাশের সাতটি স্তরের সম্বন্ধকে ক্রমানুসারে এভাবে দেখানো যেতে পারে – "*জীবনধারণের উপায় ⇒ শাসনব্যবস্থা ⇒ ভাষা ⇒ পরিবার ⇒ ধর্ম ⇒ গার্হস্থ্য জীবন ও স্থাপত্য ⇒ সম্পত্তি।*" (লুইস হেনরি মর্গ্যান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩) অর্থাৎ প্রথমে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করছে। তারপর মানুষ যখন আস্তে আস্তে দলভিত্তিক ভাবে জোট বাঁধতে শিখছে, তখন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হচ্ছে এবং একে অপরের কাছে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ভাষা যেটি মূলত আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ ইঙ্গিত ভাষা (Sign Language) – এই পর্যন্ত মানবসভ্যতার বন্য অবস্থা। তারপর জোটবদ্ধ বা দলবদ্ধ মানুষ রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের সূচনা করছে সেই সঙ্গে প্রথমে পশুপালন এবং তারপর কৃষিকার্যের সূচনা করছে বেঁচে থাকার রসদ সংরক্ষণ করার জন্য। তারপর ক্রমানুসারে ধর্মের উৎপত্তি ও সুসংবদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনের সূত্রপাতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে উত্তরাধিকারী রূপে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুনিশ্চিত করার ফলেই ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানার উদ্ভব পর্যন্ত মানবসভ্যতার বর্বরাবস্থা এবং সময়ানুসারে সভ্য সমাজের সূচনা হয়। তাই "আমরা যদি মানুষের অগ্রগতির সিঁড়ির নীচের দিকে নামতে থাকি, তার আদিম বন্য যুগের দিকে, আর সেই সিঁড়ির প্রতিটি নীচের ধাপে নামার সময় তার তৈরি প্রতিটি বিধি, রীতিনীতি, আবিষ্কার, উদ্ভাবন যে-সময়ে যেভাবে হয়েছিল সেগুলিকে ক্রমানুসারে অপসারিত করতে থাকি, তাহলে প্রতিটি যুগে মানুষের অগ্রগতির একটা সাধারণ ধারণায় পৌঁছানো যাবে।" (লুইস হেনরি মর্গ্যান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১)

আর বাঙালির বিবাহের লোকাচারের দিকগুলিকে যদি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে এগুলিও আদিমকাল থেকেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষের আদিম বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থা ও সভ্য অবস্থায় পদার্পণের সময়কাল থেকেই এই বৈবাহিক সংস্কৃতির বিকাশ হয়ে চলেছে। বৈবাহিক বিষয়ক লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশও গ্রামবাংলার হাত ধরে। গ্রামবাংলা অধ্যুষিত বঙ্গদেশেই প্রাথমিকভাবে বাঙালি হিন্দু বিবাহের লোকাচারগুলির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ফলে বাঙালি হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচারগুলি যে গ্রামবাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ভর হবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালি হিন্দু সমাজে পালনীয় এই বিবাহের লোকাচারগুলির মধ্যে দুটি বোধ লুকিয়ে থাকে। একটি হল প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা আচার-বিচার-বিশ্বাসের সংস্কারবোধ ও অন্যটি আনন্দ-অনুষ্ঠান প্রিয়তা। এই লৌকিক "সংস্কৃতির যে-দুটি সমান্তরাল ধারা – ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকসূচক এবং মানস সম্পদবিকাশী – এরা পরস্পর-সাপেক্ষ এবং আদিকাল থেকেই ধর্ম ও আচারবিধি এদেরকে সমান্তরাল বেগে প্রবহমান করেছে।" (পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ. ৩৫) তাই সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি যদি লক্ষ্য করে ক্রমানুসারে এইভাবে সাজানো যেতে পারে।

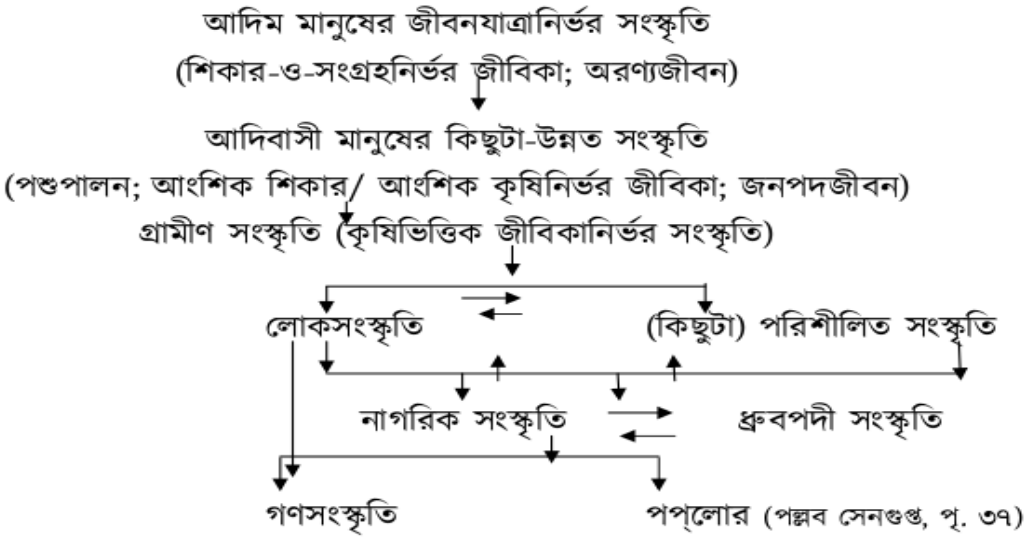

(পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ. ৩৭)

উপরের ছক থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে আমরা যাকে আধুনিক নগরসভ্যতা ও তার প্রেক্ষিতে নাগরিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করি সেটির সূত্রপাত হচ্ছে লোকসংস্কৃতি বা সময়ের আরো পিছনে গেলে দেখা যায় মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে। সুতরাং বলা যেতে পারে, "বাংলার বর্তমান সংস্কৃতি তিন শ্রেণীর – নগর-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও আদিম-সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দরবার-সংস্কৃতি বা কোর্ট-কালচার ছিল, এযুগে নগর-সংস্কৃতি হয়েছে।" (ওয়াকিল আহমেদ, পৃ. ৩১) আর নগরসভ্যতার সৃষ্টি অর্বাচীন কালে। এই সৃষ্টি বীজটিও লুকিয়ে আছে ঐ প্রাচীন গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে। কেননা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক শহরের উৎপত্তি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার পর থেকে। অবশ্য তার আগে ভাস্কো-ডা-গামার ব্যবসার সূত্রে ভারতে আগমনের পর থেকেই ভারতে আধুনিক শহরের জন্মের পূর্বাভাস দেখা দেয়। আরো পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইংরেজরা এসে কলকাতা নগরীর পত্তন করে। পাশ্চাত্যের ভাবধারায় ভারতের নগরের কাঠামো তৈরি হয়। ভোগ ও সুযোগ সুবিধার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাবও এদেশে এল। তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতে ইংরেজরা শিল্পস্থাপন করতে শুরু করল। ফলে এই শিল্প স্থাপন ও সেই সূত্রে কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে মানুষজন আস্তে আস্তে শহরে এসে ভিড় জমাতে শুরু করল। শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের জন্য গ্রামকে শোষণ করে শহরগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকল। "নগর গ্রামের উপর চেপে বসে; গ্রামকে শোষণ করে; মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয়; সমাজকে রুগ্ন করে। আধুনিক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে এই ছিল গান্ধীর অভিযোগ। নগর ও গ্রামের সম্পর্কের ভিতর তিনি ঔপনিবেশিক শোষণের আদলই খুঁজে পেয়েছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে মার্ক্সের মনে হয়েছিল যে, ধনবাদী সমাজের প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব। গান্ধীর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য এক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল: নগর ও গ্রামের দ্বন্দ্বই সমাজের প্রধান সমস্যা।... অর্থ ও ক্ষমতা উভয়েরই কেন্দ্রস্থল নগর। এখান

থেকেই দেশ শাসিত হয় এবং সে শাসন দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে নয়।...আধুনিক শিল্পায়নের ভিতরই নগরভিত্তিক শাসন ও শোষণের ঝোঁক নিহিত আছে।" (অম্লান দত্ত, পৃ. ২২৯-২৩০)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের তাগিদে ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক পরবর্তী কালে এসে আধুনিক নগর ও নাগরিক সংস্কৃতি তৈরি হলেও তার মূল সংস্কৃতি ভাবনার কেন্দ্রস্থলে থেকে যাচ্ছে গ্রামীণ লৌকিক জীবন সংস্কৃতির ছায়ারূপ বা লোকায়ত ভাবনাগুলি। যেগুলি সে আদিমকাল থেকেই ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে এখনো পর্যন্ত বহন করে নিয়ে চলেছে ঐ লৌকিক সংস্কৃতির কৃত্যানুষ্ঠানগুলিকে। বাঙালি হিন্দু বিবাহ সংস্কৃতিতে গ্রামীণ লোকাচারের বা কৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবহার হয়ে চলেছে নিরবধিকাল ধরে এবং পরবর্তী সময়ে তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রূপান্তর সহকারে গৃহীত হয়ে চলেছে। কেননা, "বাংলার নগর-সংস্কৃতি আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট। নগর-সংস্কৃতি স্বরূপে সংস্কারধর্মী এবং সঙ্করধর্মী। এখানকার চাকুরি, শিল্প, ব্যাবসায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের সহিত নিরন্তর যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে প্রভাব দ্রুত পড়ে। শিক্ষিত লোক শীঘ্রই এ সমস্ত উপকরণ রপ্ত করে নেয়।" (ওয়াকিল আহমেদ, পৃ. ৩১) পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিশ শতকের নয়ের দশকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূস্বরূপ বিশ্বায়ন এবং তার ফলশ্রুতি রূপে উদার ও মুক্ত বাজার-অর্থনীতির কারণে গ্রাম ও শহুরে জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়। উনিশ শতকে বিদ্যুতের ব্যবহার এবং বিশ শতকের শেষের দিকে প্রযুক্তিগত উন্নতি যেমন ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত করে। আর এই পরিবর্তনের প্রভাব থেকে যেমন মুক্ত হতে পারে না শহরজীবন তেমনি গ্রামজীবনও। ফলে জীবনচর্যার এই পরিবর্তন বাংলার গ্রামসমাজ ও লৌকিক সংস্কৃতিতেও থাবা বসায়। তাই এতদিন ধরে বাংলার গ্রামসমাজ যে শান্ত নীড়ে অবস্থান করছিল, সেখানেও এসে এই বিশ্বায়নের ঢেউ আঘাত করে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আসায় মর্গ্যান কথিত যে যৌথ পরিবারের ধারনা এবং সেই ধারনার উত্তরসূরী হিসেবে যে একান্নবর্তী পরিবার তৈরি হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে, সেই পরিবারগুলো ভাঙতে থাকে। ভাঙতে থাকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের পরিমণ্ডলটিও। দূরকে নিকট করার বাসনার সারা পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের (Cultural Exchange) একটি প্রবণতা দেখা যায়। ফলে বিবাহ নামক সংস্কৃতিরটিরও লৌকিক আচার এবং পদ্ধতিগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু বিবাহের পদ্ধতি এবং লৌকিক আচার বা লোকাচারগুলির অন্তর্কাঠামো এক থাকলেও তার বহিরঙ্গে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে বিবাহের বেশ কিছু পদ্ধতি এবং আচারেরও বিনির্মাণ ঘটতে থাকে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বাঙালি হিন্দু বিবাহে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্য বা দেখা-শোনার জন্য এক সময় ঘটকের প্রয়োজনীয়তা ছিল, এমনকি এখনও কিছুটা পরিমাণে হলেও আছে। বিবাহের এই ঘটকের কাজ হল পাত্রপক্ষের কাছে এসে পাত্রীপক্ষের খোঁজখবর এবং পাত্রীপক্ষের কাছে গিয়ে পাত্রপক্ষের খোঁজখবর দেওয়া; এবং ঘটকই উভয় পক্ষকে একসাথে মিলিয়ে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে পাকাদেখা পর্যন্ত কাজ সেরে দিত। কেননা, "দুটি নর-নারীর মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং সেই সঙ্গে দুটি পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যেই বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি প্রতীকি হয়ে ওঠে।" (এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক, পৃ. ১৪৩) আর একটা সময় পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে বিবাহের ব্যাপারে মূলত বাড়ির বড়দের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত এবং বাড়ির পুত্র-কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারে তারাই শেষ কথা বলতেন। এই মতামতের ব্যাপারটিকেও ড. এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক তাঁর 'বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "একজন ব্যক্তির বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কিছু ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত তথ্য পাই তাতে দেখি যে বিয়ের আগে সবার সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হয়, এবং বড়রা যে মত দেয় তাই অনুসরণ করা হয়।" (ওয়েস্টারমার্ক, পৃ. ১৪৪) সেইজন্যই হয়তো একটা সময় পর্যন্ত এবং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও গ্রামবাংলার কিছু কিছু জায়গার বিবাহের আচারের মধ্যে 'ঘটক বিদায়' অনুষ্ঠানটি এখনো কিছুটা পরিমাণে হলেও রয়ে গেছে। এই ঘটক বিদায় অনুষ্ঠানটি মূলত বিবাহকার্য সম্পাদনের পরের দিন ঘটককে তার উপযুক্ত পারিতোষিক বা অর্থমূল্য দিয়ে সম্মান সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। তাই বলা যেতে পারে বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে দেখাশোনা করে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করার রীতি বহু পুরানো। মধ্যযুগের জীবনীসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজেও বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এই ঘটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নিমাইয়ের বিবাহে বনমালী আচার্য নামে ঘটকের

উল্লেখ পাওয়া যায়; যিনি নিমাইয়ের মাতা শচীদেবীর কাছে এসে বল্লভ-আচার্য্যের কন্যার সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করছেন।

"পুত্রবিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য।।
বল্লভ-আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে।।
তার কন্যা লক্ষ্মীপ্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।" (চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৭ম, ৫৪-৫৬)

অর্থাৎ, এখানে পাত্রপক্ষের কাছে গিয়ে ঘটক পাত্রীর গুণাগুণ বলে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করছে। আবার ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে শিব-গৌরীর বিবাহে ঘটক হিসেবে নারদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। এখানেও হিমালয় ও মেনকার কন্যা গৌরীর সঙ্গে শিবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে নারদ হিমালয়ে যাচ্ছেন এবং পাত্র অর্থাৎ শিবের গুণাগুণ বর্ণনা করে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে পাকাকথা প্রায় একরকম সেরেই আসছেন।

"হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।।" (ভারতচন্দ্র, পৃ. ৯০)

আধুনিক যুগের সাহিত্যেও বিবাহের ঘটক প্রথার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করতে কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের কাছে ঘটক পৌঁছায়। "আমার নাম নীলমণি ঘটক, গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র... ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।" (রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২৮৭) অর্থাৎ বিবাহের এই ঘটকালি একশ্রেণির মানুষের জীবিকাস্বরূপও ছিল একটা সময় এবং সেটি অনেক ঘটক পরিবারের ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবসার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তবে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঘটকালি করার উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের ঘটকালি করেছিলেন তাঁর মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী দেবী। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিয়েতে ঘটকালি করেছেন। "প্রিয় ভাইঝি হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীর বিয়ের ঘটকালিটা করেছিলেন স্বয়ং কবি। ভাইঝি প্রতিভার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের আশুতোষ চৌধুরীর কাছে।" (শান্তা শ্রীমানী, পৃ. ৩৬) অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাঙালির বিবাহে ঘটক প্রায় অপরিহার্য ছিল এবং এখনো আছে।

কিন্তু ১৯৯০ পরবর্তী বিশ্বায়নের যুগে বিবাহের এই ঘটকালির প্রথাটির আমূল পরিবর্তন ঘটে, বা বলা ভালো এই ঘটকালি প্রথাটি নতুন ভাবে বিনির্মাণ হয়। ভারতবর্ষে ১৯৯১ সাল থেকে বিশ্বায়নের সূত্রপাত হয়। ঐ বছরই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল বিশ্বের কাছে। ফলে ভারতবর্ষের বাজারও বিশ্ববাজারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পুঁজির জোরে উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রমশক্তির বিপণনের এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে থাকল এই বাজারি অর্থনীতি। মানুষের হাতে কাঁচা অর্থের প্রাচুর্য্য মানুষকে আরো বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থমগ্ন করে তুলল। এই পুঁজির হাত ধরেই একদিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার ও অন্যদিকে প্রযুক্তির বিকাশের ফলে মানুষের ঘরে এল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। আর এই ইন্টারনেটের ফলেই গ্লোবালাইজড বিশ্বের লোকালাইজেশন অর্থাৎ স্থানিকীকরণ ঘটল। ফলে যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার মাধ্যমের বিপ্লব ঘটল, সেই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের আবশ্যকতা মানুষের কাছে অতিপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। আর এর ফলে সংহত পরিবার কাঠামো বা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন হল। প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন ধরনের প্রচার মাধ্যমের ফলে মানুষের জীবনমননের পরিবর্তন তার ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলল।

ফলে এই বিশ্বায়নের প্রভাবে গ্রামবাংলার একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভাঙতে শুরু করল। সামনাসামনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ কমতে কমতে বর্তমানে সেটি মুঠোফোন, ফেসবুক, টুইটারের মধ্যে বন্দী হয়েছে। আর এই সুযোগটিকেই কাজে লাগাল বাজার অর্থনীতি। মানুষের জীবনের বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার জন্য পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ প্রয়োজন। এতোদিন পর্যন্ত সেই যোগাযোগের কাজটি করে আসছিল এই ঘটক শ্রেণি বা নিকট আত্মীয় পরিজনেরা। কিন্তু পুঁজির প্রভাবে

সেই ঘটক শ্রেণি আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগল। আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের কাজটি সহজ করে দিল বাজার-অর্থনীতি। নয়ের দশকে স্থাপিত হল ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯৯০ সালে ভারতে প্রথম তৈরি হল ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট shaadi.com ; তারপর ১৯৯৬ সালে sagaai.com; এরপর ১৯৯৭ সালে bharatmatrimony.com। এরপর ২০০৩ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ টিরও বেশি ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট এবং ভারতে প্রায় ৪০ টিরও বেশি ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যায়। ইন্টারনেটের দ্বারা সংযুক্ত এই ওয়েবসাইটগুলি প্রথমে নগরজীবন ও আস্তে আস্তে গ্রামজীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। গ্রামজীবনে বিবাহের যে কাজটি ঘটকের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল, সেই ব্যবস্থাটিরই নতুন করে নির্মাণ হয়ে গেল আধুনিক বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্বারা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম আকার দেখা দিল আরো প্রায় এক-দেড় দশক পরে। মানুষের হাতে স্মার্ট ফোন ও তার মধ্যে প্রযুক্ত অ্যাপের মাধ্যমে তৈরি অর্কুট থেকে শুরু করে ফেসবুক এবং বিভিন্ন অনলাইন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে। আর এক সময়ে বিবাহের ঘটক বিদায়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঘটককে যে সামান্য পারিতোষিক বা উপহারমূল্য দেওয়ার প্রথা ছিল, অনলাইন ম্যাট্রিমনিতেও সেই ব্যবস্থাটি টিকে থাকল। তবে, ঘটক বিদায় যেমন বিবাহের শেষে হত, এক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম অর্থাৎ ভার্চুয়াল ঘটক হিসেবে পরিচিত হতে থাকা এই অনলাইন ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইট বা এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাপগুলিতে পাত্র-পাত্রী খুঁজতে শুরু করলে বা বিবাহের পাত্র-পাত্রীরা বা তাদের বাড়ির লোকেরা একে অপরের সঙ্গে 'আনলিমিটেড' যোগাযোগ করতে চাইলে আগে থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী 'ফেল কড়ি মাখো তেল' অর্থাৎ, আগে অর্থ দাও, তার বিনিময়েই পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। অর্থাৎ, অর্থই বিবাহের শুরুর মূল মানদণ্ড হয়ে উঠল। তাই বিবাহ সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসাবে ঘটকপ্রথা যে গ্রামজীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল, সেটিরই নতুন করে বিনির্মাণ শুরু হয়ে গেল পুঁজিবাদী সভ্যতার হাত ধরে।

আবার বিবাহবিচ্ছিন্ন বা বিবাহবিচ্ছিন্না-দের জন্য, বিধবা বা মৃতদার ব্যক্তিদের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট চালু হতে দেখা যায়। অথচ একটা সময়ে উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিকের সহযোগিতায় আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করলেও বাঙালি সমাজে বিধবাদের বিয়ের ব্যাপারটিকে খুব খাটো নজরেই দেখা হত চিরকাল। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে মানুষের ব্যক্তি মানুষের মধ্যে 'আমিত্ব'এর ধারনাটি যত স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল, সমাজের প্রাধান্য তত কমতে থাকল এবং এই ব্যক্তি পরিসরের জায়গাটি প্রসারিত হয়ে আত্মসুখ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সমাজের মধ্যে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহের জায়গাটি প্রসারিত হল। তবে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করার ব্যাপারে জাত-পাত, বংশ-কুল, গণ, রাশি, কোষ্ঠী বিচারের যে জায়গাটি বাঙালি সমাজে স্থানুর রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেটি যে বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবর্তিত হল, তেমন নয়। শুধু 'ব্যক্তি' গণৎকার, জ্যোতিষীদের পরিবর্তে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থাটি নব্যভাবে বহাল রইল। বিশ্বায়নোত্তর উত্তরআধুনিক যুগে সেই কাজটি করতে শুরু করল কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট। সেজন্য মাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইটগুলিও বাজারের চাহিদার অনুযায়ী তাদের রূপ পরিবর্তন করল। ওয়েবসাইটগুলিতে নতুন নতুন 'ফিচার' আসতে শুরু করল। তাই বর্তমান সময়ে শুধু বাঙালিদের জন্য, বা শুধু মারোয়ারিদের জন্য থেকে শুরু করে ভারতের প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা ম্যাট্রিমনি সাইট দেখা যায়। আবার জাতি (Caste) বিশেষেও এই ধরনের ওয়েবসাইটের ভাগ দেখা যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা তিলি প্রভৃতি জাতির জন্যও আলাদা আলাদা ম্যাট্রিমনি সাইট দেখা গেল। এমনকি এই সাইটিগুলিতে পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের পচ্ছন্দ আরো ন্যারো ও সিলেক্টিভ করার জন্য বয়স, উচ্চতা, গাত্রবর্ণ, ধর্ম, জাতি (Caste), পেশা, আয়, পছন্দ, স্যোসাল স্টাটাস, ডিগ্রি, প্রতিষ্ঠান, রাশি, লগ্ন, গোত্র, জোডিয়াক সাইন, খাদ্যাভাস, পানাসক্তি, ধুমপায়ী কিনা - প্রভৃতির ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন চলতে থাকল। অর্থাৎ, বিবাহে এই গণ, লগ্ন, রাশি প্রভৃতি বিচারের পদ্ধতি সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে এলেও সময় ও শিক্ষার প্রভাবে সেটির কিছুটা হলেও কমে এলেও তা যে একেবারে দূরীভূত হয়নি তার প্রমাণ ম্যাট্রিমনি সাইটের এই সমস্ত 'ফিল্টার ট্যাব' বা 'অপশন'গুলি। অথচ বিশ্বায়ন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব বিস্তার করেছে। পুঁজির ও প্রযুক্তির কারণে এবং সরকারী বদান্যতায় সমাজে মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে সাক্ষরতার হার বাড়ালেও (১৯৯১ সেনসাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার ৫৭.৭%, ২০০১ সালে ৬৮.৬৪%, ২০১১ সালে ৭৬.২৬%) তার মননের জায়গাটিতে সে পিছিয়েই পরে আছে। সেই জন্যই হয়তো এখনো এই বিবাহের মধ্যে ওই প্রাচীন গ্রামীণ লৌকিকতাগুলি নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে।

এছাড়াও বিবাহ ব্যাপারটি একটি বড় আনন্দ অনুষ্ঠান স্বরূপ। ফলে সেই আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাও একটি বড় ব্যাপার। একটা সময় পর্যন্ত বিবাহের এই ব্যবস্থাপনার জায়গাটিতে বাড়ির বড়রা থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন, এমনকি প্রতিবেশিরাও সাহায্য করত। আর এই ব্যাপারটি একান্নবর্তী পরিবার থাকার ফলে বিবাহ সচরাচর বাধার সম্মুখীন না হয়ে সুচারুভাবেই সম্পন্ন হত। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের ফলে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরজীবনের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'তে সেই লোকবল কমে যাওয়ায়, মানুষের ব্যক্তিব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় এবং মানুষের হাতে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিবাহের ব্যবস্থাপনার দিকটিও চলে গেল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে। তৈরি হতে শুরু করল নানা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। যারা বিবাহের শুরু থেকে পাত্র-পাত্রীর হানিমুন পর্যন্ত বিভিন্ন 'প্যাকেজ' অফার করতে শুরু করল। আর এর ফলে বাজার অর্থনীতির নিয়মেই এই 'প্যাকেজ'এর একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা শুরু হল। আর মানুষও তার জীবনের সবচেয়ে বর্ণময় অধ্যায়টিকে এই প্যাকেজের আওতায় এনে ফেলল।

আবার বাঙালি হিন্দু বিবাহের অন্যতম একটি কৃত্যানুষ্ঠান হল ঢেঁকি মঙ্গলা বা ঢেঁকি বরণ বা ঢেঁকি পূজা। এই ঢেঁকি বহুযুগ ধরে মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে। তাই লোকাচারটি পালিত হয়। বিবাহের পূর্বের এই ঢেঁকিমঙ্গলা আচার অর্থাৎ ঢেঁকিকে পূজা করে বর-কনের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। আর এই লোকাচারটিতে বিবাহের মূলত নান্দীমুখ অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় চাল কোটা এবং গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের জন্য হলুদ গুঁড়ো করা হয়। আর পূজা করার জন্য পান, সুপারি, বাতাসা-র মত উপকরণ লাগে। তবে বর্তমান সময়ে এই আচারটির পালন অনেক কমে গেছে। কেননা, এখন ঢেঁকির ব্যবহার প্রায় বর্জিত হয়ে গেছে; ঢেঁকির ধারণা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। তাই গ্রামবাংলায় কোথাও আর ঢেঁকিঘর বা ঢেঁকিশালও দেখা যায় না। শহরবাসীরও অনেকেরেই এই ঢেঁকি সম্পর্কে ধারনা খুব কম বা নেই বললেই চলে। ফলে বিবাহের প্রয়োজনের চাল বা হলুদ বেশিরভাগই মেশিনে বা মিক্সিতে গুঁড়ো করা হয়; বা বাজার থেকে চাল বা হলুদ গুঁড়োর প্যাকেটও কিনে নেওয়া হয়। এই পরিবর্তিত পদ্ধতিও প্রযুক্তি ও বাজার-অর্থনীতির অন্যতম একটি প্রভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লোকাচারটিকে বহন করে নিয়ে চলার জন্য এবং এই অনুষ্ঠানটি পালনের জন্য অনেক জায়গায় ঐ বড় ঢেঁকির রেপ্লিকা বা প্রতীকী হিসেবে একটি ছোট ঢেঁকি যেটি এক হাতে ব্যবহার করা যায়, তার প্রচলন দেখা যায়।

বাঙালি হিন্দু বিবাহের আনন্দ অনুষ্ঠানে গান একটি অন্যতম উপকরণ ছিল একসময়। 'ছিল' বললে ভুল বলা হবে, এখনো আছে। কিন্তু বিবাহের লোকাচারের বহু আচারে যে গানগুলি বাড়ির এয়ো মেয়েরা গাইত, বা শুনতে পাওয়া যেত – সেগুলির প্রচলন বা ব্যবহার প্রায় হারিয়ে গেছে বললে খব একটা ভুল হবে না। বিবাহের দিন সকাল বেলায় জলভরা-র গান, বা জলসওয়া অনুষ্ঠানের গান এখন আর শুনতে পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে এসেছে, আধুনিক ভোগ্যপণ্যের হাত ধরে নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ডি.জে বক্স থেকে শুরু করে সিডি, মোবাইল, ইউটিউব, মাইক্রোচিপ, পেনড্রাইভের প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্যে বিবাহের আনন্দ অনুষ্ঠানের স্বাদটা হয়তো পাওয়া যায়, আন্তরিকতা অভাবও বোধহয় একটু পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি বাড়ির এয়োদের বা মেয়েদের গাওয়া গানে যে ঐতিহ্যবাহী সমাজ-মানসিকতা ও পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ পরবর্তী যৌনজীবনের পালনের জন্য যে জীবনকথা এই সব গানের কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত, সেটিও হারিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও নব্য মিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির চাপে পড়ে। বাঙালি হিন্দু বিবাহ লৌকিক সংস্কৃতির এইরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় যেগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছে বা নতুন ভাবে বিনির্মিত হচ্ছে সমাজ ও সময়ের অভিঘাতে।

সুতরাং বলা যেতে পারে, বিশ শতকের শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই বিশ্বায়ন ও নগরায়নের যুগে দাঁড়িয়ে বাঙালি জীবন-সংস্কৃতির বহমান ধারাগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং হতেও থাকবে। আবার কোনোটিরও বা বিনির্মাণ ঘটছে বা ঘটতেও থাকবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরো নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ও মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ঐ কালচারাল এক্সচেঞ্জটির ক্ষেত্রটিও প্রসারিত হবে। আবার মানসিক নৈকট্য বা দূরত্বও কমা বাড়ার ফলে সংস্কৃতির মূল কাঠামোরও প্রয়োজনমাফিক বদলাতে পারে। ফলে বাঙালি হিন্দু বিবাহের লৌকিক ভাবনাগুলি বা কৃত্যানুষ্ঠানগুলির মূল রূপটি ঠিক কী ছিল, সেটি যেমন আস্তে আস্তে বর্তমান সময়েই খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তেমনি আরো কয়েক দশক বা কয়েক শতক পরও তার রূপটি কী হবে – সবটিই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের উপর।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: গতিধারা, সেপ্টেম্বর ২০১২।

ওয়েস্টারমার্ক, এডওয়ার্ড। *বিবাহের ইতিহাস*, (অনু. কাজল রায় ত্রিবেদী)। কলকাতা: দীপায়ন, জুন ২০১১।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'যোগাযোগ' *রবীন্দ্র উপন্যাসমগ্র* (২য় খণ্ড)। কলকাতা: রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

দাস, বৃন্দাবন। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, (সম্পা. দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০১-২০০২।

দত্ত, অম্লান। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, 'পল্লী ও নগর', আরতি সেন ও গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা),কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.)। *বিশ্বায়ন: ভাবনা-দুর্ভাবনা* (১ম খণ্ড)। কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

ভারতচন্দ্র, রায় গুণাকর প্রণীত। *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশ্ন লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৯৭।

মর্গ্যান, লুইস হেনরি। *এনসিয়েন্ট সোসাইটি*, (সম্পা. ও অনু. অসীম চট্টোপাধ্যায় এবং অসিত চৌধুরী)। কলকাতা: দীপায়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

মুরশিদ, গোলাম। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর, ২০০৫।

শ্রীমানী, শান্তা। *ঠাকুরবাড়ির বিবাহকথা*। কলকাতা: পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৬।

শরীফ, আহমদ। *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*। ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

www.censusindia.gov.in